

একজন

কাফিরের রক্ত



কুকুরের রক্তের মমান

ইসলামিক স্টেটের খিলাফত ঘোষণার অল্প কিছুদিন পরেই কুসেডার ও অন্যান্য কাফির রাষ্ট্রগুলো তাদের ক্রোধ ও শত্রুতার কারণে ইসলামের ভূমিতে হামলা শুরু করে। ইসলামিক স্টেটও দারুল ইসলাম ও দারুল হারবে দ্রুত অভিযান শুরু করে, যেখানে সশস্ত্র ও নিরস্ত্র কাফিরদের হত্যা করা হয়।

এ অবস্থায় বিরোধীরা ও আপত্তিকারীরা বিভিন্ন প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করে। এর মধ্যে একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন, তা হলো: এমন একজন সাধারণ নিরস্ত্র কাফির, যে যুদ্ধকারী বা যার যুদ্ধের সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই, তার রক্তপাত করা কি বৈধ?

এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ইসলামিক স্টেটের আলিমরা কুরআন ও হাদিসের শক্তিশালী দলিলের আলোকে এ বিষয়ে হুকুম ব্যাখ্যা করেন এবং মুসলিম জনগণকে দিকনির্দেশনা দেন। এই ভিত্তিতে, শরীয়তে কাফিরদের ব্যাপারে হুকুম কুরআন ও হাদিসের নীতিমালার ওপর এবং সালাফে সালাহীনের বক্তব্য ও ফাতাওয়ার আলোকে এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

প্রত্যেক কাফির সম্পর্কে প্রকৃত হুকুম হলো এই যে: সে মূলত হারবি কাফির (যোদ্ধা/সশস্ত্র), এবং তার জীবন, সম্পদ ও সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত করা মুসলমানের জন্য হালাল—যতক্ষণ না শরঈ ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে সে হারবি নয় (অযোদ্ধা)। [অনুবাদক: ‘হারবি’ বলতে তাদেরকে বোঝানো হয় যারা যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে বা সামর্থ্য আছে বা উপযুক্ত, সে যুদ্ধ করুক বা না করুক।] যদি কোনো চুক্তি বা সন্ধির কারণে, অথবা মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের কারণে, কিংবা তারা দারুল ইসলামে জিম্মি হিসেবে বসবাস করার কারণে (নিজেদের নিরাপত্তার জন্য কর প্রদান করে), অথবা শরিয়তের নির্ধারিত কোনো ব্যতিক্রমী শর্তের কারণে—যেমন কাফিরদের নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে—তাদের অযোদ্ধা হওয়া প্রমাণিত হয়, তবুও অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমের কারণ শেষ হয়ে যেতে পারে। যেমন—তাদের নারী, শিশু বা বৃদ্ধরা কোনোভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে, অথবা কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে, অথবা শরিয়তকে উপহাস করলে, কিংবা অন্যান্য কাফিরদের সাথে মিশে

তাদের চাল হিসেবে ব্যবহৃত হলে, অথবা কিসাস (প্রতিশোধমূলক শাস্তি)–এর কারণে—এই অবস্থায় তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা আর বহাল থাকে না।

অতএব, আমরা এই বিষয়ে শরিয়াহ প্রত্যেক কাফির সম্পর্কে কী হুকুম দিয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বোঝার চেষ্টা করব। যাতে মুসলমানদের মন থেকে ভ্রান্ত মতামত ও সন্দেহ দূর হয় এবং এই দুনিয়ায় কাফিরের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে আসল হুকুম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই শরিয়াহ প্রত্যেক মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের ক্ষতি করা হারাম করেছে—যদি না কোনো বৈধ (শরঈ) কারণ থাকে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: “যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রাসূল—তার রক্ত (জীবন) বৈধ নয়, তিনটি অবস্থা ছাড়া: হত্যার বদলে কিসাস (প্রতিশোধ), বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে, যে ইসলাম ত্যাগ করে এবং মুসলিম জামাআত থেকে বের হয়ে যায় (মুতাদা)।” [সহীহ বুখারী]

এই হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের মৌলিক হুকুম হলো “হুরমত” (প্রবাহিত করা অবৈধ)—অর্থাৎ তা ক্ষতিগ্রস্ত করা নিষিদ্ধ; তবে কোনো শরঈ বৈধ কারণ থাকলে ব্যতিক্রম হতে পারে, যেমন কিসাস, রিকদাহ (ইসলাম ত্যাগ) বা হুদ শাস্তি।

পক্ষান্তরে, কাফিরের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের মৌলিক হুকুম হলো “হিল্লাত” (প্রবাহিত করা বৈধ)—অর্থাৎ মুসলিমের জন্য তা অনুমোদিত; তবে কোনো শরঈ বৈধ কারণ থাকলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যেমন নিরাপত্তার চুক্তি থাকা, জিম্মি হিসেবে বসবাস করা, অথবা কোনো মুসলিমের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করা।

কুরআন, হাদীস এবং নেককার সালাফদের বক্তব্য ও ফতোয়া থেকে ধারাবাহিক দলিল উপস্থাপনের আগে একটি বিষয় জানা জরুরি; যদি কোনো কাফিরের সঙ্গে চুক্তি বা সন্ধি থাকে, অথবা তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, কিংবা সে জিযিয়া কর দিতে সম্মত হয়, তাহলে তাদের যথাক্রমে “মু‘আহিদ” (চুক্তিবদ্ধ), “মুস্তামিন” (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত) এবং “জিম্মি” (জিযিয়া প্রদানকারী) বলা হয়।

অন্যদিকে, যে কাফিরের কোনো চুক্তি নেই,

তাকে কোনো আশ্রয় বা নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি এবং সে জিযিয়া দিতেও রাজি নয়—তাকে “মুহারিব” বা “হারবি” (যোদ্ধা/যুদ্ধরত) বলা হয়। এই সংজ্ঞা সেই সব কাফিরের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়, যারা মুসলমানদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধাবস্থায় নেই। কারণ কাফিরদের ক্ষেত্রে “হারবি” হুকুম প্রযোজ্য হয়—শুধুমাত্র তিনটি শ্রেণি ব্যতীত; অর্থাৎ মু’আহিদ, মুস্তা’মিন ও জিস্মি।

অতএব, কুফরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য যা একজন কাফিরকে “হারবি” (যোদ্ধা/মিলিটারি) বানায়, এবং এর ফলেই তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান হালাল তথা বৈধ হয়ে যায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন; “যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহের ঈমান আনে না এবং শেষ দিনেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না, আর সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজে হাতে জিযিয়া দেয়। আত-তাওবাহ: ৯১]

এই আয়াতে আল্লাহ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, “তারা ঈমান আনে না।” এবং এই ভিত্তিতেই তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছেন, যতক্ষণ না তারা জিযিয়া দিতে সম্মত হয় এবং লাঞ্ছনাকর জীবনযাপন করে। এছাড়া, আল্লাহ মুশরিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদের কুফর ও শিরকের কারণে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ঈবলেন; এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাঙ্গিকভাবে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। আত-তাওবাহ: ৩৬]

আল্লাহ ঈবলেন; মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করো, তাদেরকে পাকড়াও করো, অবরোধ করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকো; কিন্তু যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত কয়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও; নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এই দুইটি আয়াত থেকেও স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ মুশরিকদের শিরকের কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মুসলমানদের জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ করেছেন। যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিযিয়া প্রদান করে অবনত অবস্থায় বসবাস করতে সম্মত হয়।

নবী ﷺ বলেছেন:

“আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কয়েম করে এবং ফরয যাকাত আদায় করে। অতঃপর তারা যদি তা করে, তাহলে তারা তাদের জীবন ও সম্পদকে আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নেবে শুধুমাত্র ইসলামের অধিকার ছাড়া। আর তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট হবে।” [সহীহ বুখারী] এবং নবী ﷺ আরও বলেছেন: “প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান অপর মুসলিমের ওপর হারাম (অর্থাৎ রক্ত প্রবাহিত করা, সম্পদের ক্ষতি করা হারাম)।” [সহীহ মুসলিম]

এই হাদীসগুলোর রেফারেন্সই যথেষ্ট হওয়া উচিত; নতুবা এই প্রবন্ধ অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। অন্যথায়, এ বিষয়ে আরও বহু হাদীস রয়েছে। উপরের হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, যখন কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার জীবন, সম্পদ ও সম্মান সুরক্ষিত হয়ে যায়। অতএব, ফিকহের একটি নীতিমালা—“মুখালাফাতের ধারণা”—অনুযায়ী এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার রক্ত ও সম্পদের কোনো সুরক্ষা ছিল না; বরং তা হালাল ছিল। এবং এই হাদীসের শব্দগুলো বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, এখানে “মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে” কথাটি সমগ্র মানবজাতিকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ সকল মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ নবী মুহাম্মাদ ﷺ সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাই তাঁকে আদেশ করা হয়েছিল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে, যতক্ষণ না তারা তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং দ্বীনে প্রবেশ করে। অতঃপর তারা যদি তা করে, তাহলে তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান মুসলমানদের জন্য হারাম (অর্থাৎ নিরাপদ) হয়ে যায়। অন্যথায়, তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল—এমনটাই এই হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট।

তাহাড়া, এখানে সালাফদের কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রমাণ করবে যে কাফিরদের রক্তের কোনো মূল্য নেই। যেমন উমর رضي الله عنه হুদাইবিয়ার শান্তিচুক্তির সময় তার তরবারি আবু জুন্দালের দিকে ঘুরিয়ে ধরেছিলেন, যখন তার পিতা তাকে বন্দী করে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহর দৃষ্টিতে কাফিরের রক্ত কুকুরের রক্তের সমান (অর্থাৎ তা প্রবাহিত করায় কোনো ক্ষতি নেই)।”

ইমাম শাফিঈ رحمه الله বলেছেন: আল্লাহ একজন মুমিনের রক্ত ও সম্পদকে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ (অর্থাৎ সে মুরতাদ হয়ে গেলে) ছাড়া হারাম করেছেন এবং একজন কাফিরের রক্ত ও সম্পদকে বৈধ করেছেন—যদি না সে জিযিয়া প্রদান করে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরাপত্তা দেওয়া হয়। (Aala: B1 P103)।

ফকীহগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই শরঈ নীতি উল্লেখ করেছেন যে, “কাফিরের রক্তের কোনো মূল্য নেই, যদি না তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।” [(Raddul Mukhar: B15 P445, Badayie alsanayie: B15 P284, Durrul Mukhtar: B4 P803)]

ইমাম ইবন তাইমিয়া رحمه الله বলেছেন: “যদি কোনো কাফির যোদ্ধা হয়, তবে তার যোদ্ধা হওয়াই তাকে হত্যা করা, তার সম্পদ গ্রহণ করা এবং তার স্ত্রীকে বন্দী করার বৈধতা প্রদান করে।” [Majmooul fatawa: B32 P343]

ইমাম ইবন কুদামাহ رحمه الله বলেন: “বাস্তব কথা হলো, যদি কোনো কাফির নিরাপত্তা চুক্তির অধীনে না থাকে, তবে তার রক্ত বৈধ (অর্থাৎ তাকে হত্যা করা বৈধ)।” [Alsharhul Kabeer: B10 P560]

ইমাম শাফিঈ رحمه الله নিজেই কাফিরদের ওপর রাতের আক্রমণ বা হত্যাকাণ্ডের সময় লক্ষ্যবস্তু হওয়া শিশু ও নারীদের সম্পর্কে বলেন; রাসুলুল্লাহ ﷺ এর এই বক্তব্য যে “তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত” —এর অর্থ হলো তাদের দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: প্রথমত, তারা মুমিন হিসেবে গণ্য নয় (অর্থাৎ তারা মুসলিম নয়)। ফলে তাদের রক্তকে হারাম হিসেবে গণ্য করা হয় না এবং তারা দারুল ইসলামের নাগরিকও নয়; যা তাদের ঘরবাড়িতে আক্রমণ করা থেকে বাধা দেয় না। (আর-রিসালাহ: পৃ. ২৯৯) এই সকল যুক্তি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সকল কাফিরের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানের মৌলিক বিধান হলো “হিল্লাত” (অর্থাৎ হালাল/বৈধ)। আর কুফরের বৈশিষ্ট্যই একজন কাফিরকে “যোদ্ধা” বানায়, যার রক্ত ও সম্পদ মুসলমানের জন্য বৈধ হয়ে যায়—যদিও সে দারুল হারবে সবজি বিক্রি করা একজন সাধারণ কাফির হোক, অথবা দারুল ইসলামের একজন পুরনো বাসিন্দা হলেও এখন ইসলামী সরকারের কাছে জিযিয়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ কাফিরদের জীবন ও সম্পদ তখনই সুরক্ষিত থাকে যখন তারা জিযিয়া প্রদান করে। এ কারণেই আলী رضي الله عنه বলেছেন: “তারা জিযিয়া প্রদান করেছে যাতে তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতো এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো (সুরক্ষিত) হয়ে যায়।” [Almoghanna: B20 P467, Durrul mukhtar: B4 P403]

এই সকল দলিলের ভিত্তিতে, যদি “ইসলামিক স্টেট” কাফিরদের ওপর আক্রমণ করতে চায়—তারা সাধারণ নাগরিক, আমলা বা আধুনিক যুগে তাদের জন্য ব্যবহৃত যেকোনো পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন—তাহলে “ইসলামিক স্টেট”-এর মুজাহিদরা এ ধরনের কাফির বেসামরিকদের ওপর আক্রমণ করার ক্ষেত্রে শরিয়তের বিরুদ্ধে যায় না; বরং তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, যে বৈশিষ্ট্য এসব বেসামরিক ব্যক্তিকে “সামরিক” বা “হারবি” (যাদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ) বানায় তা হলো “কুফর”—যদি না পূর্বে আলোচিত ব্যতিক্রমী শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকে। অতএব, “ইসলামিক স্টেট”-এর মুজাহিদরা সশস্ত্র কাফির ও নিরস্ত্র কাফিরের মধ্যে পার্থক্য করে না। কারণ আল্লাহ আমাদের সকল কাফির ও মুশরিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন, এবং একই আদেশ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ কেও দেওয়া হয়েছিল—যতক্ষণ না কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিযিয়া প্রদান করে অপমানিত অবস্থায় জীবনযাপন করতে সম্মত হয়।

“আর আল্লাহ তাঁর কার্যসম্পাদনে প্রবল ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।”

